ভুল বলারও যোগ্য না

আব্দুল্যাহ আদিল মাহমুদ

বিজ্ঞানী উলফগ্যাং পাউলি। তাঁর সামনে ভুল বা বেফাঁস কথা বলে ফেললে একদম নিস্তার নেই। একবার এক বন্ধু পাউলিকে এক তরুণ পদার্থবিদের একটি গবেষণাপত্র দেখালেন। বন্ধুটি নিজেও বুঝতে পারছেন গবেষণাপত্রটি ভাল কিছু নয়। তবুও পাউলির মত জানতে চাইলেন। পাউলি বললেন, এ তো এমনকি ভুলও না। কথাটি পরে মানুষ উদ্ধৃতি দিল এভাবে: এটা তো ঠিক না-ই, এমনকি ভুলও না।

ভুলের চেয়ে খারাপ আবার কী হতে পারে? ভুল মানেই তো ঠিকের উল্টো। মিথ্যা বা অসত্য। এর চেয়েও কি খারাপা বা নেতিবাচক কিছু হতে পারে?

বিজ্ঞানের কথা এলেই কেন যেন টলেমির কথা মনে পড়ে যায়। হোক সেটা বিজ্ঞানের ইতিহাস কিংবা স্বরূপ বিশ্লেষণ। বিশেষ করে টলেমির সেই গ্রহের মডেল বা নমুনা। মহাবিশ্বে পৃথিবী ও গ্রহদের নিয়ে দেওয়া সেই কথাগুলো। টলেমি তাঁর অ্যালমাজেস্টে অন্যান্যের মধ্যে ভূকেন্দ্রিক মহাবিশ্বের ধারণা প্রথম সুপ্রতিষ্ঠিত করেন। সেটা এক ভয়াবহ ভুল। এখন আমরা জানি।

সন্দেহ নেই। কিন্তু তবু কত মহান সেই তত্ত্ব! মহান এ জন্যে নয় যে সেই তত্ত্বটি ছিল মহাবিশ্বকে বুঝতে পারার প্রচেষ্টায় একটি প্রাথমিক অগ্রগতি। যার উপর ভিত্তি করে ধীরে ধীরে আমরা ক্রমেই মহাবিশ্বের আরও সঠিক ধারণা জানতে পেরেছি। আবার বলছি, নিছক এ কারণটির কারণে টলেমি ও তাঁর তত্ত্ব মহান নয়।

এ কথা বলার পেছনে কারণটা বুঝতে হলে জানা চাই বিজ্ঞান কী ও কী নয়। বিজ্ঞান কীভাবে কাজ করে।

বিজ্ঞান মূলত অনেকগুলো বৈজ্ঞানিক তত্ত্বের সমাবেশ। আর বৈজ্ঞানিক তত্ত্ব হলো একটি মডেল, যা পর্যবেক্ষণে পাওয়া ঘটনাকে ব্যাখ্যা করতে পারবে এবং ভবিষ্যতে কী ঘটতে পারে সেটা সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট অনুমান বা পূর্বাভাস দিতে পারবে। বৈজ্ঞানিক তত্ত্বকে কখনোই সঠিক বলা যায় না। তত্ত্বের পূর্বাভাস পরিবর্তী পর্যবেক্ষণের সাথে এক শ একবার মিলেও গেলেও আপনি বলতে পারবেন না তত্ত্বটা সঠিক বা নিঁখুত। হতে পারে, পরেরবারই পূর্বাভাস ভুল হয়ে যাবে।

পরিসংখ্যানবিদ জর্জ বক্সের কথাটি তাই যথার্থ, “সব মডেলই ভুল, তবে কিছু মডেল কার্যকর।“

পরিসংখ্যানের ছাত্র ও শিক্ষক হওয়ার সুবাদে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির সাথে সম্পর্কটা আরেকটু গভীর আমার। পরিসংখ্যানে আমরা ডেটা বা উপাত্ত নিয়ে কাজ করি। তারপর সেটা থেকে সবচেয়ে ভাল মডেল দিয়ে প্রেডিকশন বা পূর্বানুমান করি। পূর্বাভাস দেই। যে মডেল সবচেয়ে ভালোভাবে পূর্বাভাস দিতে পারে, সেটা নিয়ে আরও কাজ করি। জর্জ বক্সের কথা অনুসারেই, কোনো মডেলই বাস্তব জগতকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা করতে পারে না। কিন্তু যতটুকু পারে সেটা বাস্তব কাজকর্মের জন্যে যথেষ্ট। কার্যকর।

বৈজ্ঞানিক তত্ত্বগুলোও পর্যবেক্ষণে পাওয়া তথ্য-উপাত্ত নিয়ে এভাবেই কাজ করে। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, নিউটনের মহাকর্ষীয় তত্ত্বের কথা। অনেক সুন্দর তত্ত্ব। কিন্তু আমরা জানি, এটা আসলে একটি ত্রুটিপূর্ণ তত্ত্ব। বুধ গ্রহের কক্ষপথের সঠিক ব্যাখ্যা তত্ত্বটি দিতে পারেনি। যেটা পেরেছে আইনস্টাইনের সার্বিক আপেক্ষিক তত্ত্ব। কিন্তু আমরা আরও জানি, নিউটনের তত্ত্ব ভুল হলেও কার্যকর। এই তত্ত্ব দিয়েই মহাকাশে যান পাঠানো হয়। যদিও বড় ভরের বস্তুর ক্ষেত্রে তত্ত্বটি ভুল ফল দেয়। নিউটনের গতিবিদ্যাও সব রকম গতিকে ব্যাখ্যা করতে পারে না। ব্যর্থ অতিপারমাণবিক জগতের কণার গতির ব্যখ্যা দিতে। বা আলোর বেগের কাছাকাছি বেগে চলার বস্তুর গতির সঠিক বিবরণ দিতে। চিরায়ত গতিবিদ্যা কৃষ্ণবস্তুর বিকিরণ ব্যাখ্যা করতে পারে না। পারে না আলোকতড়িৎ ক্রিয়া কিংবা হাইড্রোজেনের মতো সরল পরমাণুর ব্যাখ্যা দিতে।

নিউটনের তত্ত্বের বদলে আসা আইনস্টাইনের সার্বিক আপেক্ষ তত্ত্বও কি নিখুঁত? বিজ্ঞানীরা এখনই জানেন, তত্ত্বটায় কোথাও গোলমাল আছে। যদিও ২০১৫ সালের মহাকর্ষ তরঙ্গ আবিষ্কারের মাধ্যমে তত্ত্বটি নিজের শক্তির জানান দিয়েছে। কিন্তু ঐ যে একই কথা। তত্ত্বটা কার্যকর। কিন্তু সঠিক দাবি করা যাবে না। বলা যায়, ২০১৫ সালে তত্ত্বটা আরও একবার আত্মরক্ষা করেছে।

আকাশে গ্রহদের এলোমেলো চলাচল দেখে প্রাচীন গ্রিক জ্যোতির্বিদ টলেমি বলেছিলেন, পৃথিবী মহাবিশ্বের কেন্দ্র। সবাই পৃথিবীকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। ঘুরছে গ্রহরাও পৃথিবীর চারদিকে নিজ নিজ কক্ষপথে। তবে গ্রহরা আবার নিজের কক্ষপথের মধ্যেই আরেকটি ছোট বৃত্তাকার কক্ষপথেও ঘুরছে। এর মাধ্যমে গ্রহদের এলোমেলো চলাচলের দারুণ ব্যাখ্যা পাওয়া গেল। তত্ত্বটি দারুণ প্রশংসা কুড়াল। কিন্তু তত্ত্বটি অনুসারে চাঁদ ও পৃথিবীর দূরত্ব মাঝেমাঝে সাধারণ দূরত্বের অর্ধেক হয়ে যাওয়ার কথা। যা ভুল। এভাবে ভাল এই তত্ত্বও ভুল প্রমাণিত হয়।

****

**চিত্র: টলেমির মডেল**

**[টলেমির মডেলে পৃথিবীর অবস্থান ছিল মহাবিশ্বের কেন্দ্রে, এবং একে ঘিরে রাখা আটটি গোলক মহাকাশের সবগুলো বস্তুকে ধারণ করে রেখেছিল।]**

এক কথায়, কোনো তত্ত্বই সঠিক নয়। নিছক কার্যকর। কাজে লাগিয়ে দারুণ কিছু কাজ করা যায় এই যা।

কিন্তু টলেমির তত্ত্ব মহান। কারণ এই তত্ত্ব বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করেছে। পর্যবেক্ষণে যা দেখা যাচ্ছে তার একটা ভাল ব্যাখ্যা দাঁড় করিয়েছে। এছাড়াও দিয়েছে ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট পূর্বাভাস। যদিও একটুর জন্যে তা ভুল হয়ে গিয়েছিল।

এখন ধরা যাক, আমি একটা তত্ত্ব দিলাম: সূর্যের যে আলো আমরা দেখি তা আসলে দুটি সূর্যের মিলিত আলো। এই বক্তব্য কি নিছক ভুল? না, বৈজ্ঞানিকভাবে ভুলের চেয়ে খারাপ। এই বক্তব্য পর্যবেক্ষণে পাওয়া তথ্যকে ব্যাখ্যা করতে পারে না। টেলিস্কোপে চোখ রেখে আমরা সূর্যকে দেখতে পারি। কিন্তু দুই সূর্যের কোনো ইঙ্গিত পাওয়া যায় না। আবার এই তথ্য দিয়ে সুনির্দিষ্ট কোনো পূর্বাভাসও দেওয়া যাবে না। অন্তত এমন পূর্বাভাস যেটাকে ভুল বা ঠিক বলার জন্যে যাচাই-বাছাইয়ের দরকার আছে।

এখানেই একটি তত্ত্বের গ্রহণযোগ্যতা। তত্ত্ব ভুল বা ঠিক হতেই পারে। কিন্তু শুরুতেই তাকে পর্যবেক্ষণের ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে হবে। পাশাপাশি বলতে হবে কী হলে কী ঘটবে। সেই পূর্বাভাসের উৎস হতে হবে তত্ত্ব নিজে। কোনো তত্ত্ব এমন একটি কাঠামো দাঁড় করাতে না পারলে সেই তত্ত্বকে না দেখেই ময়লার ঝুড়িতে ফেলে দেওয়া যাবে। তত্ত্ব ভুল হতেই পারে। তবে সেই ভুল প্রমাণ হতে হবে পর্যবেক্ষণ থেকে। অর্থাৎ, ভাল তত্ত্বের প্রধান বৈশিষ্ট্য হলো ভুল প্রমাণের যোগ্যতা। তত্ত্বে এমন কিছু কথা থাকতে হবে যা ভুল হলে তত্ত্ব ভুল বলে প্রমাণিত হবে।

যেমন ধরুন আইনস্টাইনের সার্বিক আপেক্ষিকতার কথা। তত্ত্বটির একটি কথা ছিল, মহাকর্ষ তরঙ্গের অস্তিত্ত্ব আছে। মহাকর্ষ চলে আলোর বেগে। এই কথা ভুল প্রমাণ হলে তত্ত্বটি ভুল প্রমাণিত হবে। কথাটি ঠিক হওয়া মানে এই নয় যে তত্ত্বকে সঠিক বলতে হবে। বরং এর মাধ্যমে তত্ত্বটি আরেকবার নিজেকে বাঁচিয়ে রাখল। নিজেকে মিথ্যা প্রমাণের পরীক্ষায় আত্মরক্ষা করতে পেরেছে।

বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে মিথ্যা প্রমাণের এই পরীক্ষার আবশ্যকতার প্রবর্তন করেছেন প্রভাবশালী দার্শনিক কার্ল পপার। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে তত্ত্বের গ্রহণযোগ্যতা নিয়ে তিনি ১৯৩৪ সালে লেখেন *লজিক ডার ফুরচং* বইটি। ১৯৫৯ সালে নিজেই একে ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। নাম দেন দ্য লজিক অব সায়েন্টিফিক ডিসকভারি। এখানেই তিনি ফলসিফিকেশন টেস্ট বা মিথ্যা প্রমাণের পরীক্ষার বিষয়টি তুলে ধরেন। অবিজ্ঞান (non-science) ও মেকিবিজ্ঞানকে (pseudo-science) বিজ্ঞান থেকে আলাদা করতে ফলসিফিকেশন টেস্টের বিকল্প নেই।

ফলসিফিকেশন টেস্টের মাধ্যমে আরোহ পদ্ধতির অন্তর্নিহিত ত্রুটির সমাধান হয়েছে। বৈজ্ঞানিক তত্ত্বে একটি প্রশ্ন হলো কীভাবে পর্যবেক্ষণ থেকে সূত্র বের হবে? ধরা যাক একটি বক্তব্য হলো সব হাঁসের রং সাদা। এই বক্তব্য আমরা পরীক্ষা করব। ধরা যাক, আমরা সামনে একটি সাদা হাঁস দেখলাম। এটা থেকেই আমরা সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলতে পারব না। বলতে পারব না, এই যে দেখো একটি সাদা হাঁস। অতএব সব হাঁস সাদা। আরোহ পদ্ধতি এভাবেই কিন্তু কাজ করে ও সিদ্ধান্ত নেয়। হয়তো বা পর্যবেক্ষণ আরও বেশি করা হয় (একটির বেশি হাঁস)।

পপার বললেন, এ পদ্ধতিতে কখনোই প্রমাণ করা যাবে না সব হাঁস সাদা। সে তুলনায় ফলসিফিকেশন টেস্ট স্পষ্ট সিদ্ধান্ত দিতে পারে। সব হাঁস সাদা-এই বক্তব্যকে ভুল প্রমাণ করার জন্যে একটি কালো (বা সাদা ছাড়া অন্য রংয়ের হাঁস খুঁজে পাওয়াই যথেষ্ট)।

<https://www.theguardian.com/science/2005/sep/19/ideas.g2>

https://en.wikipedia.org/wiki/Not\_even\_wrong